৭৫ এর ৭৫ উপন্যাস

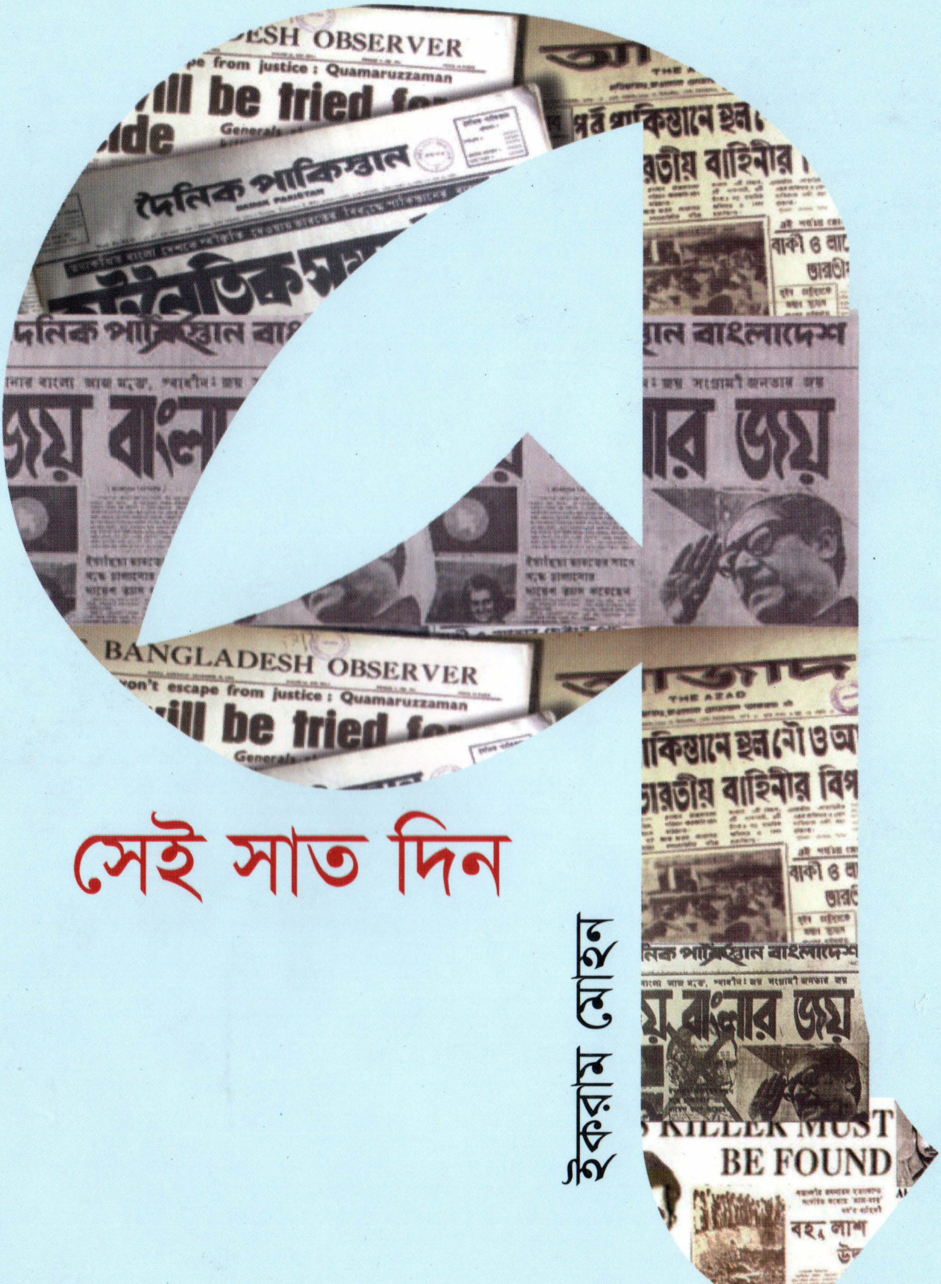

সেই সাত দিন

ইকরাম মোহন

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। কুমিল্লার ঘাগুটিয়ার জামে মসজিদে আস্তানা গাড়ে এক দল পাকিস্তানি আর্মি। গ্রাম পুড়ে ছাই করে দেয়। মুক্তিবাহিনীও চালায় প্রতিরোধ আক্রমণ। যুদ্ধ চলে কয়েক দিন। শেষে ২৩ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে মিলিটারিরা। সেই ঘটনা অবলম্বনে একাত্তরের তিতাসতীরের সেই গ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে 'সেই সাত দিন' উপন্যাসে।

৭১ এর
৭১ উপন্যাস

প্রচ্ছদ
চন্দন চৌধুরী

ইকরাম মোহন
জ. ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০
ঘাগুটিয়া, হোমনা, কুমিল্লা

পিতা: মজিবুর রহমান মোহন
মা: শেফালী বেগম
পাঠপর্ব: এমকম (এমজিটি)
পেশা: ব্যবসা

কাব্য: বিলুপ্ত হবার ভয়ে ছাদে যাইনি (২০০৭)
সম্পাদক: জলকাচ ও রাশপ্রিন্ট (লিটল ম্যাগাজিন)
সহযোগী সম্পাদক: বেহুলাবাংলা (লিটল ম্যাগাজিন)

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

৭১

৭১ উপন্যাস

সেই সাত দিন

ইকরাম মোহন

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

© লেখক

প্রকাশন
বেহুলাবাংলা
৬১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫
দুলালপুর, হোমনা, কুমিল্লা ৩৫৪৬
behulabangla2015@gmail.com
www.bchulabangla.com

প্রকাশনা সহযোগী
অদ্রি ফাউন্ডেশন
৭৮/ই, পুরানা পল্টন লেন, দ্বিতীয় তলা, বিজয়নগর, ঢাকা

পরিবেশক : রকমারি ডটকম, সর্বনাম ডটকম

মুদ্রণ
বিশ্বাস প্রিন্টার্স, ২৬৩ গাউস্সুল আজম মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫

৭১ নামলিপি : দেওয়ান আতিকুর রহমান

প্রচ্ছদ
চন্দন চৌধুরী

মূল্য ১৩৫ টাকা
US $ 7

Sci Sat Din by Ikram Mohan
A Publication of Bchulabangla; First Edition: February 2016
61 Concord Emporium Shoping Complex
253-54 Elcphant Road, Katabon, Dhaka 1205.
Dulalpur, Homna, Comilla 3546.

ISBN : 978-984-92182-3-4

উৎসর্গ

ঘাগুটিয়ার সকল শহীদ

ও

মুক্তিযোদ্ধাদের

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

সেইসব দিনগুলো

রাতে নৌকায় ঘুমিয়েছে আফজাল। মেঠো অন্ধকারে তার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে জেনে গেছে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আর কোনো জড়তা নেই ঘুমাতে। এখন ইচ্ছেমতো ঘুমানো যাবে। এই তিতাসের কোলে সে বহুদিন ঘুমিয়েছে। কিন্তু মাঝখানে কত দিন ঘুমানো হয়নি। নয় নয়টা মাস। কম কথা নয়। আফজাল নৌকার মাচাঙে শুয়ে আছে। মুখ তার আকাশের দিকে। রাতের কুয়াশার মধ্যে দেখতে থাকে প্রিয়দগ্ধ স্মৃতি। সে তাকায় তার প্রিয় তিতাস আর গ্রামের দিকে–

ঘাগুটিয়া। তিতাস পাড়ের গ্রাম। গ্রামের সকল কর্মকাণ্ড তিতাসকে ঘিরে। গ্রামের মানুষের প্রাণ, জীবন-জীবিকা যাতায়াত সবকিছু এ নদীকে ঘিরে। তিতাস ভরা যৌবনের নদী। সারা বছর এর দুই কোল জোড়া জল। বুক ভরা ঢেউ আর উচ্ছ্বাস।

আপন গন্ধে জোয়ারভাটায় বয়ে চলে সে। ভোরের মৃদু আলোয় জেগে ওঠে। ভর দুপুরে চোখ রাঙানিতে তেঁতে ওঠে। রাতের তারারা আর জোনাকি ও ঝিঁঝি পোকা ঘুমপাড়ানি গান শোনায় কিন্তু তার ঘুম আসে না। সে কোথাও এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে সরল রেখায়, কোথাও আবার সর্পিল গতিতে। সে ভয়ংকর নদীর খাতায় নাম লেখায়নি কখনো। চাইলেই কেউ সাঁতরে ওপার যেতে পারে। আবার ওপারে যেতে বড় ডিঙির প্রয়োজন হয় না।

সে চলেছে তার কৃপণতাহীন শাহী মেজাজ।

'গভীর অন্ধকারে ঘুম হতে নদীর ছলছল শব্দে জাগিয়া উঠিলাম আবার।
তাকিয়ে দেখিলাম পাণ্ডুর চাঁদ।
চাঁদ থেকে তার অর্ধেক ছায়া, গুটিয়ে নিয়েছে যেন কীর্তিনাশার দিকে।'

তিতাসের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ। সে উদার। এর তীরবর্তী গ্রামের মানুষগুলো যেন তার সন্তান। পরম যত্নে লালন করে। সকলের দুঃখ-সুখে

মিলেমিশে থাকে। পরম মততায় আগলে রাখে মানুষগুলোকে। তার জলে মাছ ধরছে দাস। তার খেওয়ে ঝাটিভর্তি মাছ। পবনের ভৈরব জালের শেষাংশে রুপালি চিকচিক চাপিলা। আজিজ মিয়ার নৌকার গলইভর্তি বৈচার দাপাদাপি। মুক্ত ভূঁইয়ার সরেঙার ডগার বেলে মাছে টইটম্বুর। বিরল দাশের চাই ভরা গোঁফওয়ালা চিংড়ি।

এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে কানিবক ধৈর্য্য নিয়ে। পাশে সত্যিই পানকৌড়ির মুহুর্মুহু ডুবসাঁতার। শুশুকের উথালিপাথালি ফুসফাস আর গরমা মাছের দীর্ঘশ্বাস। বড় পাতার কচুরিপানা খাদ্য হয় তোতা ভূঁইয়ার গরুর। কলমিডগার শাক ভাজার ঘ্রাণ দেয় আম্বিয়া ও ফেলানীর ঘরে। নল-খাগড়ার ছাওনি আছে সুফিয়ার চালে। কই আর গুতুমের কাদায় ছলাৎ ছলাৎ হাসির ঝিলিক দেখায় মোসলেম গদার চাঁদমুখে। তিতাস তীরের প্রতিটি মানুষের ঘরে দুঃখের চেয়ে সুখ বেশি।

আজ কী যেন এক অজানা আতংকে মুখ গোমরা করেছে সে। ঠিক কত দিন আগে এ হাসির ঝিলিক মিলিয়ে গিয়েছিল কেউ জানে না। একদা নীলকুঠির কেল্লা গড়ে উঠেছিল কিনা কে জানে। কিংবা মগদের ছিপনৌকা রক্ত লড়াইয়া মানুষের রক্তে আর হাতি ঘোড়ার রক্তে লাল হয়েছিল কি না তার, কে জানে!

চৈত্রের আলোয় কোনো এক বিকেল। সবুজ প্রান্তরে আকাশ ছুঁয়েছে মাটিকে। মাঠে প্রান্তরে অঢেল সবুজ খেলা করার কথা। সবুজের সমারোহ কমে গেছে। লোঙগার জমির শুরুতে গ্রামের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় এক বটগাছ। বটের পাতায় খেলা করে চৈত্রের রুপালি আলো। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের উঁকিঝুঁকি। বাতাসে সাড়া পড়ে বটবৃক্ষের ডালে ডালে। সামান্য দূরে তিতাসে ব্যাপারি নৌকার গুনটানা ও হল্লা। মাঝির ভাটিয়ালী সুরে-বেসুরে গলায় চলে গান নামের চিৎকার। কুলকুল শব্দে এগিয়ে চলে কোনো এক সাপ্তাহিক হাটের উদ্দেশ্যে। হাক পাড়ে মাঝি জোরে গুন টান। টুপটুপ গোসল করছে গ্রামের বৌ-বেটি আর নাংগা ছেলের দল। বটগাছের ডালে ঝুলে আছে এক সবুজ কিশোর। সবুজ মানুষ। বাতাসে বট পাতায় শিস বাজায়। আফজালের মনে রঙিন স্বপ্ন। গাঢ় সবুজ স্বপ্ন। স্বপ্ন বোনে। রীনা তার দিকে

কেমন করে তাকায় তা নিয়ে ভাবে। আফজাল প্রকৃতির সাথে খেলে। ঘাসের খুব কাছাকাছি ওর মুখ। নাক ছুঁয়ে যায় কচি ঘাসের ডগা। সবুজ ঘাসের ডগায় সুরসুরি লাগে নাকে ও ঠোঁটে। অনুভব করে এক নারী মূর্তির। শরীরে অন্যরকম এক শিহরণ, লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়। বাতাসে নেচে ওঠে যেন এক অমোঘ শিহরণ।

ঠাট্টা ও বিদ্রূপের ফিসফাস কিংবা ক্রোধ শব্দ, উষ্ণতা ও হাসির ছটা। একা মাঠে গরুগুলো ঘাসের লিপ্সায় এদিক-ওদিক করছে। একটি তরুণ একা। সুনসান বৃক্ষতল। বটগাছের কচি শিস নিয়ে চুকচুক বাঁশির সুরটা তার কাছে অন্যরকম শোনায়। কেমন যেন মোহনীয় শব্দ। চিৎকার করে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে তার। সে বুঝতে পারে প্রেমে পড়েছে। কেউ নয়, সে প্রেমে পড়েছে রীনার।

রীনা তার প্রেমে পড়েছে কিনা সে জানে না। তবে রীনার তাকানো দেখে আফজাল স্থির থাকতে পারে না। শরীরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। প্রায় সময়ই ভাবে ও আমার দিকে এভাবে তাকাল কেন। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে। যখন তার কাছে সব কিছুই ভালো লাগে। আফজালের এখন সে বয়স। রীনা দেখতে যদিও আহামারি সুন্দরী নয়, তবু তার কাছে রীনাকে পরির মতো মনে হয়। সারাক্ষণ রীনাদের বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করে। ইদানিং তার কাজে তেমন মন নেই। সবসময় কোনো না কোনো কাজে ভুল সে করবেই। গরুর ঘাস দিতে বললে সে যাবে মাছ ধরতে।

রীনা অবশ্য এসব পাত্তা দেয় না। নিজেকে সব সময় আড়াল করে রাখতে পছন্দ। কিংবা কারো চাপে আড়ালে থাকে। বাবা মায়ের কড়া শাসন। কিংবা গ্রামের নারীর লজ্জাই ভূষণ। আফজালের ঘুরঘুর তার নজরে পড়ে। অন্য চোখে তাকায় তার দিকে। অনুভব করে এক উচ্ছলটান। দোলা দেয় মনে। সমাজের মানুষের চোখে প্রেমে পড়া এক মহাপাপ। মানুষ কুলটা গাল দিবে। লজ্জায় পড়তে হবে বাবা-মার কাছে। তাই সে তার হাত সেই দিকে বাড়ায় না। তক্কে তক্কে মন দেয়া-নেয়া চলে। কিন্তু মানুষের চোখ এড়ায় না। পাড়াপ্রতিবেশীর কানাঘুষা হয়। দু-একজন প্রতিবেশী ইতোমধ্যে বলেও দিয়েছে আফজাল ও রীনার বাবা-মাকে।

কেউ আবার বলছে– দেশটাতে বউ-ঝি, পুত লইয়া চলনের আর জোগার নাই। আশপাশে যেই প্রেমপিরিতি চলতাছে। পুলা মাইয়া সব নষ্ট হইয়া যাইব। কী কও গো আফজালের মা?–বলে টিপ্পনি কাটে।

আফজালের মা তার আগামাথা কিছু না বুঝে হু হা করে।

পরে আরো খোলসা করে বলে, পোলাডার দিকে একটু নজর দেও। ওমুকের মাইয়ার খপ্পরে পইরা তো গোল্লায় গেল তোমার পোলা।

আবার একই কথা বলে রীনার মাকেও। সমাজে এ ধরনের ব্যক্তিরা দু-দিকেই সুবিধা নেয়।

থেমে থাকে না আফজাল ও রীনার মন দেয়া-নেয়া। এক রাতে তারা দেখা করবে এমন কথা হয়েছে।

রাতে আসে রীনা আফজালের কাছে। থরথর কাঁপুনি নিয়ে এগিয়ে চলে বাগানের নামার দিকে। পাশাপাশি হাঁটছে। ভয়লেশহীন এগিয়ে চলে একে অপরকে অনুসরণ করে। কারো মুখে কোনো রা নেই। আছে এক অমোঘ উত্তেজনা। দুরুদুরু বুকে রীনা অনুসরণ করছে আফজালকে। আবার ভয়ও হচ্ছে পাছে কেউ দেখে ফেলে। ওরা কোথায় এসেছে বুঝতে পারে না। বোধ হয় আকাশ ও দীগন্তের মিলনস্থলের কোনো এক জায়গায়। চারদিকে রুপালি জোসনা। পাশাপাশি দু-জন যুবক যুবতী কিংবা কিশোর কিশোরী। আকাশের এখানে-ওখানে সাদা হাসির মতো চকচকে মেঘ। দাপুটে জোছনা। ঝিঁঝি পোকার একটানা চিৎকার। সুনসান নীরবতা ভেঙ্গে আফজাল বলে, কেমন আছ?

ঝনঝনিয়ে হেসে উঠে রীনা, যেন এক বীণার ধ্রুপদী টংকার–আমাকে এত রাতে এখানে ডাকছ কেন? কেউ দেখলে কি সর্বনাশ হবে জানো?

কী হইবো? জিজ্ঞেস করে আফজাল।

সবাই মিলে আমাদের নিয়ে ছি ছি করব।

কেন? আমরা কি পাপ করছি নাকি?

কী বলবা, তাড়াতাড়ি বলো।

কিছু বলব না, তোমার সাথে এই জোনাক দেখবার জন্য আসছি।

শুধুই কি জোনাক না কি অন্য কিছু–বলেই এক দৌড়ে হনহনিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে রীনা।

স্বপ্নের ফেরিওয়ালার মতো তাকিয়ে দেখে আফজাল আর রুপালি জোসনার বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে মন্দ্রিত হলো প্রেমমোহ ভাবনার সাগরে। স্বপ্ন আঁকছে ভবিষ্যতের ভবিতব্য নিয়ে। হেঁটে চলছে ক্ষেতের আইল ধরে বাড়ির দিকে এক স্বপ্নযাত্রায়। যেন এক মগ্নখেলার যন্ত্রপুতুল সে।

সারা দিন সামান্য কিছু কাম-কাজ করে টইটই করে ঘুরে বেড়ানো ও শয়তানের পাছায় বাঁশ দেয়া ছাড়া যেন আর কোনো কাজ নেই আফজাল ও সোবানের। লেখাপড়ার পাট চুকিয়েছে সেই কবে। ক্লাস ফোর পর্যন্তই শেষ। যেন এর চেয়ে বেশি লেখাপড়া করতে নেই তাদের।

এর মধ্যেই গ্রামে হঠাৎ করেই বেড়ে যায় শহুরে মানুষের আনাগোনা। হঠাৎ এসব মানুষ দেখে অবাক হয় গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলো। এরা হয়তো কারো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কারো আবার আত্মীয়ের আত্মীয়। আপ্যায়নের ঘাটতি নেই। কারো মুখে কোনো হাসি নেই। যেন হাসির দেবতার অপমৃত্যু হয়েছে।

আফজালের স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে যায়। ধোয়াশার মাঝ থেকে সে যেন জেগে ওঠে। হরেন্দ্র মাঝির ডাক আসে কানে। সে বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে। হরেন্দ্র মাঝি বলে, কি রে আফজাল, হুনছত নি?

কী কও জেডা?

আরে কইতাছিলাম, দেশ নাকি স্বাধীন হইছে?

হ জেডা।

তয় আমগো কানু কই? হেয় তো আইলো না।

আইব আইব। চিন্তা কইরো না।

চিন্তা কী আর সাধে করি রে।

যাও যাও। ঘুমাও গিয়া। দেখবা তোমার পোলা আইয়া পড়ছে।

হ, আইলেই ভালা। তবে মনডা খচখচ করে। ভালো লাগে না। হের মা-য় দো হুদা কান্দে।

জেডি মারে কানতে না করো। দেশ দো স্বাধীন, আইয়া পড়বো নে।

তুই কী আজগা নৌকায়ই ঘুমাইবি?

হ জেডা। অনেক দিন তো নৌকায় ঘুমাই নাই। আজগা ঘুমাই। আজগা দো আর কোনো ডর নাই।

আইচ্ছা বলে চলে যায় হরেন্দ্র মাঝি।

২

কানু, কানু দাস। ঢাকা কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্র। অত্যন্ত মেধাবী নয়, মাঝারি মানের ছাত্র। এ ধরনের ছাত্রদের দিয়ে কিছু হয় না, এটা কানুর বক্তব্য। বন্ধু মহলে সব সময় বলে–আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। আমি হাওল্লাও না, ঝাওল্লাও না, বৈরাগ্যের নাওয়ের লাঠি। তার আক্ষেপ ভাষা-আন্দোলনের সময় সে যুবক ছিল না কেন। সে শহিদ হতে পারত। দেশের একটা কাজে অন্তত লাগত। কানু যে বাড়িতে ভাড়া থাকে, বাড়িওয়ালা ধার্মিক। ছিমছাম গোছের মানুষ। একতলা টিনসেড বাড়ি। সেখানে কয়েক জন ছাত্র ব্যাচেলর ভাড়া থাকে। তবে সবাই মুসলমান হতে হবে এবং খাঁটি দেশপ্রেমিক। মানে পূর্ব পাকিস্তানপ্রেমিক। কানু নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে ভাড়া নিয়েছে। কারণ কলেজের কাছাকাছি এত অল্প টাকায় ছিমছাম বাসা পাওয়া দায়। সে হলে থাকতে পারত কিন্তু থাকেনি, কারণ হলো নোংরা ও ছারপোকায় ভরা। একদিন এক বন্ধুর সাথে থেকেই মজা বুঝছে। তারপর থেকেই ভগবানের দিব্যি দিয়ে হলে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কানুর সাথে প্রায়ই বাড়িওয়ালার রাজনীতি সংক্রান্ত কথা হয়। আর বাড়িওয়ালা তাকে খুব পছন্দ করে। ডেকে নিয়ে কথা বলে। কারণ সে মনোযোগী শ্রোতা। আসল নাম নাম শাহ্ আব্দুল মান্নান হলেও এমনিতে আব্দুল মান্নান। শাহ্ শব্দটা পরে যোগ করেছে। কারণ শাহ্ লাগাতে নামের পাশে একটা সুফি সুফি ভাব আসে। সবাই সমীহ করে কথা বলে। এক সময় দেখা যাবে তার মুরীদানা পেতে চাইবে মানুষ। মৃত্যুর পর তার কবর

মাজারও হয়ে যেতে পারে। কিংবা দেশের যে অবস্থা, কোথাকার মার কোথায় গিয়ে পড়ে বলা যায় না। কানুকে ডেকে নিয়ে শাহ আব্দুল মান্নান বলে, স্বাধীন পূর্ব বাংলা কথাটা এখন শোনা যায়। ঐ মিয়া, যাও নাকি ঐ দিকে?

কানু বলে, কোন দিকে চাচা?

ঐ ৩২ নম্বরের দিকে?

কানু মাথা নোয়ায়। শাহ মান্নান বলে, শোন মিয়া, শেখ মুজিব হলেন হিন্দুদের নেতা। তার কথা শোনলে দেশটা আবার হিন্দুদের হয়ে যাবে। ঐ যে স্বাধীনতার কথা বলে এগুলো কোনো কাজের কথা না। অখণ্ড ভারতে মুসলমানরা অত্যন্ত কষ্ট করেছে। জিন্নাহ সাহেব ছিলেন মহাপুরুষ। তিনি আমাদের মুক্তি দিয়েছেন হিন্দু আর ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে। অকৃতজ্ঞের মতো আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না। হিন্দু বাড়িতে মুসলমান গেলে সেই বাড়ি অপবিত্র হয়ে যেত। সেই বাড়ি তারা আবার গোবর দিয়ে লেপে পবিত্র করত। কি আমার পরিস্কার! গোবর হলো গরুর গু। গু দিয়ে আবার পরিস্কার! যাউগ্গা সেই কথা, মুসলমানরা ময়ড়ার মিষ্টির দোকানে বসে মিষ্টি খেতে পারত না। আমার প্রিয় হলো মিষ্টি। সুন্নতী জিনিস। নবীজি মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন। বলো ছোবাহান আল্লাহ।

কানু মৃদু কণ্ঠে বলে, ছোবাহান আল্লাহ।

ঐ মিয়া এই কথা জোর দিয়ে বলতে হয়। যত জোরে বলবা তত ছোয়াব। মুসলমানগো নগদ পয়সা দিয়ে ভিখারির মতো হাত বাড়িয়ে মিষ্টি খেতে হতো। আজ যারা স্বাধীনতার কথা বলছে, তারা কি এই অপমান দেখছে? ইণ্ডিয়া একটা গভীর ষড়যন্ত্র করছে এটা বোঝা যাচ্ছে। এখন যাও আমি জোহরের নামাজ পড়ব। তারপর মোনাজাত। দেশের জন্য মোনাজাত হবে।

কানু উঠতে যাবে এমন সময় শাহ মান্নান বলল, বস। খান সাহেবদের দেশপ্রেম কতো দেখ। আইয়ুব খান সাহেব জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লেখা প্রেসিডেন্ট হাউসের একটি পত্রের কপি তোমাকে পড়ে শোনাই, তারপর বিদায় হবা।

প্রেসিডেন্ট হাউস
২৪ মার্চ ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় জনগণের কথা চিন্তা করে দেশের রাজনৈতিক বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান উদ্বেগজনক অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায়, ক্ষমতার আসন থেকে নামিয়া যাওয়া ছাড়া আমি কোনো গত্যান্তর দেখিতেছি না। তাই আমি পাকিস্তান দেশ রক্ষা বাহিনীর হাতে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ায় সাব্যস্ত করিয়াছি। কেননা সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমাত্র কর্মক্ষেত্র ও আইনানুগ যন্ত্র।

আয়ুব খান।

দেখছ কি দেশপ্রেম!

কিন্তু চাচা দেশে আরও সংঘাত বাড়ল বৈকি কমল না।

কি কও মিয়া! দেশ আগের চাইতে ঠাণ্ডার দিকে যাইতেছে। আস্তে আস্তে বুঝবা পাকিস্তানি আর্মি কি জিনিস। পাছাত বাইরাইয়া জয় বাংলা বাহির করব। এহন যাও, আমি জোহরের নামাজ পড়মু।

শাহ মান্নান নামাজের শেষে দোয়া শুরু করল। অত্যাধিক লম্বা দোয়া। দেশের শান্তি কামনা থেকে আর্মিদের দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষে যে দোয়া করল তা হলো শাহ মান্নানের কোনো সন্তান নাই, তাই সে আরেকটা বিয়া করবার খায়েস করছে। ঐ ঘরে একটি পুত্র সন্তান হলে নাম রাখবে ইয়াহিয়া খান। অত্যাধিক তেজি আর মোরতবার নাম।

পঁচিশে মার্চ রাত। কানু ধানমন্ডি ৩২ নং বাড়ি থেকে ফেরার পথে বন্ধু সালামতের বাসায় গিয়েছিল। অনেক দিন দেখা হয় না তাই। কিন্তু রাতে না খেয়ে ফিরতে দেয়নি সালামত। খেতে খেতে রাত্রি ১১:৩০। এত রাতে গাড়ি না পেয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছে। বাসা খুব দূরে না, নীলক্ষেতের মোড়। বাসায় পৌছার পূর্বেই দেখল রাস্তায় মানুষ দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছে। উপায় না দেখে কানুও দৌড়াতে লাগল। কোথায় যাবে? চারদিকে অন্ধকার। আক্রমণ চালায় পাকআর্মি। চারদিকে চিৎকার আর গুলি কামানের গর্জন। তারাবাত্তির মত আগুনের ফুলকি উড়ছে মেশিনগানের মুখ থেকে। রাস্তায় মেলিটারি ট্রাক, জিপ আর ট্যাংক। একটানা ট্যা ট্যা শব্দ। ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, মানুষের কান্না চিৎকার। তারও কিছু পর সারা শহর আলোকিত হলো। অসংখ্য বাড়িতে আগুন। একসাথে সারা শহরে গোলাগুলি, তাণ্ডবলীলা, হত্যাযজ্ঞ ও অসুরনৃত্য। কোথায় কী হচ্ছে কেউ জানে না। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

অচেনা এক বাড়িতে আটকা পড়েছে কানু। উপায় না দেখে দৌড়ে এলিফ্যান্ট রোডের একটি বাসার দেয়াল টপকে দরজাতে ধাক্কা দিচ্ছিল। ভয়ে না খোলায় সে অন্য প্রান্ত দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে আশ্রয় নেয়। সারা রাত ছাদে কাটিয়ে নেমে আসে সকালে। সবার মুখে আতঙ্ক। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না। অন্য দিন হলে তাকে চোর সাব্যস্ত করত।

সারা দেশে কার্ফু। বিরতি ২ ঘণ্টা। রাস্তায় বের হয়ে কানু বাসার দিকে রওনা দেয়। সেখানে এসে দেখল পুরো বাড়ি মাটির সাথে ভস্মীভূত। ছাত্রদের কেউ নেই। দু-একজনের লাশ পড়ে আছে, অর্ধ পোড়া অবস্থায়। বাড়িওয়ালা শাহ মান্নানের লাশ দেখতে পেল। গুলিবিদ্ধ লাশ। কানু বুঝল শহর নিরাপদ নয়। গ্রামের বাড়িতে যেতে হবে। কিন্তু যাবে কীভাবে? লঞ্চে যেতে হলে নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে। নারায়ণগঞ্জ থেকে দিনে তিনটা লঞ্চ ছাড়ে। এদিকে কার্ফু উঠছে মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য। এই সময়ের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ যাওয়া যাবে না। মনে মনে ভাবল রিকশায় করে মিল ব্যারেকে চলে গেলে ভালো। পোস্ত গোলা। সেখানে ১ রাত মুকবুলদের কাছে থেকে পরদিন কার্ফু উঠলে যাওয়া যাবে নারায়ণগঞ্জ।

শহরে গাড়ী নেই, দু-একটা রিকশা চলছে। সময় আছে মাত্র ৪০মিনিট। রিকশাওয়ালাকে বললে সে বলল, উঠেন স্যার নিয়া যামু। তয় একখান কথা আছে। ভাড়া যাই দেন আমি কিন্তু কথা কইতে কইতে রিকশা চালামু। আপনি বিরক্ত হইয়েন না।

কানু বলল, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি এলাকা দেখে যাবা।

আমি অলি গলি চিনি। আমরা হইলাম খানদানী রিকশাওয়ালা। বাপ দাদা থেকে রিকশা চালানি শিখছি।

যাবার পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিস্তব্দতা বুঝতে বাকি রইল না। এখানে নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছে। জয় বাংলা বন্ধ করার জন্য প্রতিটা হলে হানা দিয়েছে মিলিটারিরা। যারা হলে ছিল কাউকে রেহাই দেয়নি। ছাত্রীদের হলও বাদ যায়নি। প্রতিটা হলে ঢুকেছে আর্মি। তাদের পরিকল্পনা ছিল একটা ছাত্রও যেন বের হয়ে যেতে না পারে। মানেটা এমন–জয় বাংলা অনেক সহ্য করেছি, আর না। এবার একটা উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে।

পাকিস্তানি আর্মির ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর ঢাকা অপারেশনের দায়িত্ব ছিল ৫৭ বিগ্রেডের অধিনায়ক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। মেজর জেনারেল খাদেমের উপর দায়িত্ব পড়ল ঢাকা ছাড়া বাকি দেশ শায়েস্তা করার। ১৮ বিগ্রেড পাঞ্জার, ২২ বিগ্রেড বেলুচ, ৩২ বিগ্রেড-এর যৌথ দল আক্রমণ করল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী, আয়া, পিয়ন, চাপরাসী কেউ বাদ পড়ল না। ৩২ আরবাব পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পাঠাল রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ১ হাজার পুলিশকে বিদ্রোহের শিক্ষা দেবার জন্য। ১৮ পাঞ্জাবকে পাঠাল পুরান ঢাকার গাদ্দারদের জন্মের শিক্ষা দিতে, বিশেষ করে মালাউনদের।

২২ বালুচ বিগ্রেডের পিলখানায় ইপিআরদের ঠাণ্ডা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ৪৩ হালকা বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্ট দায়িত্ব পেল তেজগাঁও বিমান বন্দরের। রাতের মধ্য প্রহরে মেজর জাফরের নেতৃত্বে এক প্লাটুন কমান্ডো গেল ৩২ নং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধরতে। সামরিক বাহিনীর জিপে তাকে আনা হলো ক্যান্টনম্যান্টে। পরে পাঠিয়ে দেয়া হবে পাকিস্তানে কিংবা সামরিক আদালতে বিচার হবে কিংবা পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা। জেনারেল টিক্কা খানের

নির্দেশ ছিল এমন তাণ্ডব তৈরি করো যাতে মায়ের বুকের দুধ জমে দই হয়ে যায়। আর পালের গোদাটাকে আটকাও, তাহলেই দেশ ঠাণ্ডায় জমে একেবারে বরফ।

রিকশা চলছে বেশ গতিতে। রিকশার যত গতি রিকশাওয়ালার বকবকানো তত গতি। কানুর মনে হচ্ছিল রিকশা থেকে নেমে যায়। কিন্তু নামলে রিকশা যোগাড় করা যাবে না। তাছাড়া রিকশাওয়ালার শর্ত ছিল। তাই সব শুনে যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে হা হু করা ছাড়া কিছুই বলছে না কানু। একদিকে রৌদ্র, অন্য দিকে চারদিকে বিভীষিকা, যত্রতত্র লাশ। আর জীবনের ঝুঁকি।

রিকশাওয়ালা বলে, আমি কথা বলছি আর আপনি হু হা করে যাচ্ছেন, কিন্তু কিছুই বলছেন না। আমি একটা শুল্ভুক দেই ভাঙ্গান।

চোখ রাঙিয়ে কানু বলে, এটা শুল্ভুক ভাঙানোর টাইম হলো? চারদিকে কতো লাশ আর কান্না।

রিকশাওয়ালা বলছে, স্যার এই কি? দুই ঘণ্টায় এত্তো লাশ দেখছি যা গা সওয়া হইয়া গেছে। আপনেও গা সওয়ান। গণ্ডগোল এত্তো সহজে ছাড়বো না। আরো কত লাশ দেখবেন!

পুরান ঢাকার নাজিরা বাজার পৌঁছতেই কার্ফু শুরু হয়ে গেল। সবাই যার যার বাড়িতে। কানু রিকশা থামাতে বলে সালামতের খালার বাসায় উঠবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নেমে ভাড়া দিতেই রিকশাওয়ালা বলল, স্যার, দোয়া করবেন, একটা আর্মি যেন আমি মারতে পারি। তাইলে মরলেও আমার আড্ডি পচবো। শালা এমনেও মরছি ওমনেও মরছি।

কানু দৌড়ে সালামতের খালার বাসায় ঢুকে দেখে বাহিরে তালা। তালা ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে ফিরে যেতে চাইতেই ভেতর থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর বলল, কানু দাঁড়াও, চাবি দিচ্ছি।

কানু ভেতরে ঢুকে দেখল সালামতের খালুজান, সবাইকে বলছে আস্তে ধীরে সব কিছু গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। কাল কার্ফু উঠার সাথে সাথে গ্রামের পথে রওয়ানা দেবে।

পরদিন। দুই ঘণ্টার কার্ফু বিরতি। সাথে সাথে কানু রওয়ানা দিল মুকবুলদের বাসায়। যাবার পথে একটু শাখারি বাজার হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার। শাখারি বাজারে তাদের অনেক দু'সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকে। কারো কারো বাসা চিনেও সে। গলিতে প্রবেশ করার সাথে সাথে চোখে পড়ল ট্রাক নিয়ে কিছু সুইপার আর ডোম লাশ সংগ্রহ করছে। কানু দেখল মানুষের লাশ, অমানুষ দ্বারা বিকৃত লাশ, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিশোর-কিশোরী শিশুর বিভৎস লাশ। চারদিকে ইমারতগুলো ভেঙ্গে গেছে। বিহারিরা বাড়িঘর লুটপাট করছে। একটু এগুতেই ইংলিশ রোডের মুখে পড়ে আছে গতকালের সেই রিকশাওয়ালার লাশ ও তার রিক্সা। লাশটি এখনো তাজা। মনে হচ্ছে গত রাতে তাকে মারা হয়েছে। আক্ষেপ হচ্ছে তার জন্য ও তার ইচ্ছে পূরণে ব্যর্থতার জন্য। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলছে কানু মিলব্যারাকে বাসার উদ্দেশ্যে। সেখানে যাবার পথে ও দেখল রাস্তা ও নদীর ধার থেকে রশিতে টেনে টেনে ডোম ও সুইপাররা লাশ উঠাচ্ছে। বহু লাশ দড়িতে বাঁধা ও মুখমণ্ডল ঝলসানো। লাশের বুক অসংখ্য গুলিতে ঝাঝড়ানো, মাথা চুর্ণ বিচুর্ণ, মগজ বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে রূপসী যুবতীর উলঙ্গ লাশ, হৃদপিণ্ড বের হওয়া, যোনিপথ ও বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত। কানু সাহস করে ডোমদের একজনকে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কোথায় নিয়ে যাবে?

সামান্য উত্তর ধলপুর ময়লার ডিপোতে।

(সূত্র : বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়)

কোনো যানবাহন না পেয়ে কানু ট্রেনে উঠল নারায়ণগঞ্জ যাবার জন্য। মুকবুলদের বাসায় যাবার আর সাহসে কুলাল না। ট্রেনে চড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর পেছনে পড়ে রইল বিভৎস আর মৃত্যুপুরী ঢাকা।

৩

রাজ্জাক মেম্বার ঘরে পায়চারী করছে। আর রাগে গজগজ করছে। আর তার রাগ হচ্ছে বড় মেয়ের জামাইয়ের উপর– কোন পুংগির পোলার কাছে মাইয়া বিয়া দিছি কোনো খোঁজখবর নাই। এদিকে মাইয়াডা আমার পোয়াতি। দেশের যা অবস্থা কীসের থেকে কী হয় বলা যায় না।

রান্না ঘর থেকে মেম্বার সাহেবের চিল্লানি শুনছে আর চোখের পানি ফেলছে রাবেয়া বেগম। তার চোখের পানি স্বামীর রাগের জন্য নয়, দেশের কথা ভেবে। সবাই বলাবলি করছে এইবার শেখের বেটায় একটা কিছু করবো। আবার কেউ বলছে পাঞ্জাবরা কি ছাইড়া দিব? তাগোর মুখের কথা মানে বন্ধুকের নল। মাইয়াডা দূর দেশে থাকে জামাইয়ের লগে। শেফালীর বাপ আগেই বলেছিল দূরে চাকরী করে এমন পোলার কাছে বিয়া দিমু না।

মেম্বার হাঁক ছাড়ে– কই খাওন দিবা নাকি? কাইন্দ না। যতদিন শেখ মুজিব বাইচ্চা আছে ততোদিন ভয়ের কোনো কারণ নাই। লোকে বলে দেশের পরিণতি ভয়াবহ। আমার কাছে কিছুই মনে হচ্ছে না। বরং আরও ভালো হয়েছে ইয়াহিয়া ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না অত সোজা নয়? বাঙ্গালী সস্তা জাতি নয়। জোর করেই ক্ষমতা আদায় করে ছাড়বে। ইলেকশন হলো বাঙ্গালী জিতল। কিন্তু অবিচার সেই বাপের আমল থেকেই দেখে আসছি। আমাদের শান্তিমতো থাকতে দেবে না।

এসব আজেবাজে চিন্তা রাখেন তো, এসব নিয়ে মাথা গরম করলে চলবে না। স্বপ্না আর মাইনুলকে নিয়া খাইতে বসেন। আপনাদের জন্য গরম গরম মাছের বড়া ভেজেছি।

রাখ তোমার বড়া। স্ত্রীকে ধমকায় রাজ্জাক মেম্বার। আমি আছি বড় মাইয়া আর নাতনির চিন্তায়। তোমার কথায় আসমতের পোলার কাছে মাইয়া বিয়া দিছি। কইলা পোলা সুন্দর আর মাস্টার। ঐ শালার পুত মাস্টার হইলে কী হইবে ওর বুদ্ধি হাঁটুর নীচে। সারাদিন হুক্কা টানে আর কাশে। কুমিল্লার নাম রাখছে–

হুক্কা খরম নাইল্লা

এ তিনে কুমিল্লা

আপনি একটা চিঠি লিখে পাঠান তাগো কাছে। তাড়াতাড়ি চইল্লা আসুক। বলল রাবেয়া বেগম। ি

চঠিতো পাঠাইছি। ঠিকমত পৌছলে তো। সারাদেশে গণ্ডগোল। আমার ডরডা আরেক দিকে। পুংগির পুরো নামতো আবার শেখের বেটার নামে নাম। রাস্তায় কোনো আর্মি ধইরা নি আবার শেখ মুজিব মনে কইরা মাইরা ফালায়।

আসমত বেপারী বারবাড়ি হতে হাকায় মেম্বার সাহেব ঘরে আছ নি? মেম্বার সাহেব?

রাজ্জাক মেম্বার বিয়াইয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে বলে, আসেন বিয়াই সাহেব, এতক্ষণ আপনার কথাই হচ্ছিল। কেমন আছেন?

আর থাকা। উত্তর দেয় আসমত বেপারি। আবার বলে, দেশটা নষ্ট হইয়া গেল। ব্যবসা বাণিজ্য সব গেল। শেখ সাহেবের ভাষণের দিন থেইক্কা আইজ প্রায় ২৫-২৬দিন ধইরা ব্যবসা বাণিজ্য সব শেষ। যাক সে কথা, আমি আসছি মোহনের ব্যাপারে কথা কইতাম। দেশে তো গণ্ডগোল লাগছে। তাগো লাইগা তো আপনার বিয়াইন কান্নাকাটি করতাছে।

আমি চিঠি দিছি। বলল মেম্বার, কী হবে দেশটার?

ছাতা হবে দেশের, বেপারির উত্তর।

তেইশ বছর ধইরা দেখতাছি। লেখাপড়া না করলেও কিছু না কিছু তো বুঝি। এদেশের মানুষ কিছু করতে পারল? ছয় দফা, এগারো দফা, কিছুই টিকল না। রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি। সামরিক শক্তিতে গোর্খাদের পরই পাকিস্তান আর্মিরা তেজি। তাদের ভাষাই বন্ধুকের নল। দলে দলে বাঙালী মরবে।

এ অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পাকিস্তান, বলল মেম্বার।

না, এ দেশের মানুষ। আজিজ আহাম্মদের শাসন কালেই বিদ্রোহ করার দরকার ছিল। এখন সব হাড়ে হাড়ে বুঝতাছে।

নান্নু মোল্লার বাড়িতে ৩ ব্যান্ড রেডিও। আউয়াল কিনেছে। সন্ধার সময় মেলা জমে সবাই বিবিসি শুনতে আসে। আবার শুনতাছে বাঙ্গালীর নাকি আলাদা রেডিও ষ্টেশন হবে। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা

সবাই আসে খবর শুনতে। খবর শুনে অনেক মুরুব্বিদের মন্তব্য–কি কামডা আছিল তাগোরে চুলকানির, আমরা কি খারাপ আছিলাম? সব ইন্ডিয়ার কু-বুদ্ধি।

তরুণদের রক্ত টগবগ করে। অনেকেই দল বেঁধে মিছিল করে

'জয় বাংলা'

একটা একটা আর্মি ধর,

ধইরা ধইরা জবাই কর।

ছোবান মিয়া। আঠার বছর বয়স। যুদ্ধে যাবার পায়তারা করছে। তার বাবা বজলু মিয়া রাগী মানুষ। তার কথা–কাম করমু ভাত খামু। এসব যুদ্ধ টুদ্ধ আমাদের কাম না। শিক্ষিত মাইনষের কাম দেশ নিয়া ভাবা। আমরা মুর্খ মানুষ অত ভাবাভাবি নাই। ছোবানের মাকে বলে, তোমার পোলাকে বুঝাও।

ছোবানের মা সাফিয়া বেগম স্বামীকে বলে, ছেলেরে ঘরে আটকাইতে হইলে একটা ভালা মাইয়া দেইখা বিয়া করাইয়া দেন। তাইলে মন থেইক্কা যুদ্ধের কথা যাইব গা।

খিস্তি করে বজলু মিয়া। তোমার যা কথা, এমুন দুধের পোলারে বিয়া করাও। নাকে টিপ দিলে এহনও দুধ পরব। এত তাড়াতাড়ি বিয়া করাইলে কাচা বাঁশে ঘুণে ধরব।

এইডা ছাড়া আর কোনো পথ নাই। কোন টাইমে যে পোলা ফুরুত।

শোনো, সারা দিন চোখে চোখে রাখবা। আর রাইতেও। আর পোলায় টাকা পয়সা চাইলে দিবা না।

ছোবান সারাক্ষণ চোখে চোখে থেকেও সবার সাথে মিলিত হয়ে বিবিসি শোনে ও ট্রেনিংয়ে যাওয়ার মওকা খোঁজে। আর যাবেই না কেন? মে মাসে যখন লঞ্চে কইরা আর্মিরা যাইতেছিল ঘাগুটিয়া গ্রামের সবাই যার যার কামে ব্যস্ত। হঠাৎ আক্রমণ। ছোবান গরু নিয়া মাঠ থেকে ফিরছিল। চারদিকে বিকট আওয়াজ। গুলি আর মর্টার সেল ছাড়ছিল আর্মিরা। ছোবান গরু ছেড়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ছিল। আসমত চাচার বাড়িতে একটা মর্টারসেল পড়ে এবং পুরা ঘরটি লণ্ডভণ্ড হয়। তার মাইয়া হাওয়া মারা যায় তার চোখের সামনে। তার কী

অপরাধ ছিল? আমাদের কী অপরাধ? ঐ দিন বহু মানুষ আহত হয়। তাদের কাছে মনে হইল আমাদের কাউরে তারা ছাড়বো না। তারা আবার আইবো। সবাইরে মারবো। মরনই যখন লাগবো, যুদ্ধ কইরা মরবো। তাও এ দেশ থেইক্কা ঐ জানোয়ারগোরে তাড়াবো। আমার আর সহ্য হয় না। এদিকে কোন দিন যে ট্রেনিংয়ে যামু আমাগোর আগে আশপাশের অনেক গ্রাম থেকে লোকজন গেছে গা।

আফজাল ক আমরা কবে যামু? বলল ছোবান।

যাইতে তো চাই কিন্তু সবাই এক সাথে মিলিত হয় না, চল সবার সাথে আবার বসি।

কানু বাড় ফিরেছে। সব কিছু বর্ণনা করে সে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় তারা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ট্রেনিং যাবে। মনসুর মাঝির কেরাই নৌকাকে বলে রাখছে কীভাবে আগরতলা সীমান্তে পৌঁছবে। সবকিছু ঠিকঠাক। দুই দিন নৌকা ফেরত দিয়েছে, কারণ সবাই বাড়ি থেকে বের হতে পারেনি। কারো কারো টাকা জোগাড় হয়েছে, কারো হয়নি। ছোবান বাড়ি থেকে এক মন চাল চুরি করেছে। বিক্রি করেছে পাশের বাড়ির এক চাচার কাছে। সেও পুরো দাম না দিয়ে অর্ধেক দাম দিয়ে বিদায় করেছে। কিছু বলতেও পারছে না কারও কাছে, পাশে বাবা-মা জেনে যায়। ছোবান, হাসেম, সিরাজ... সবাই প্রস্তুত। গভীর রাতে বাবা মায়ের অনুমতি ছাড়াই রওয়ানা দিয়েছে।

আফজালের মনটা খারাপ। আফজাল কিছুতেই নিজেকে ট্রেনিংয়ের জন্য পারফেক্ট মনে করছে না। তারা মোট ১৭জন। নৌকা থেকে তারা নামল সার্কাস বাজার। তাদের একত্রে পাঠানো হয় মতিনগর বর্ডার দিয়ে আগরতলার রসুনগর কংগ্রেস ভবনের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে। সেখানে ১৪ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়সের বিভিন্ন পেশার মানুষ। টানা ১২ দিন চলে প্রশিক্ষণ। অবর্ণনীয় পরিশ্রম। তবে কারও সেটা মনে হয়নি। কারণ প্রত্যেকের মনে একটাই ইচ্ছা, দেশ থেকে ঐ জানোয়ারদের বিতাড়িত করবে। খানা বলতে দুবেলা দুটো করে চাপ্টি রুটি আর কাঁচা মাসকলাই সিদ্ধ। সকালে প্রশিক্ষণ, বিকালে ফায়ার। প্রশিক্ষণ শেষে সবাই ভাবছিল একত্রে নিজ এলাকায় শত্রুমুক্ত করতে যাবে।

কিন্তু একেক জনকে একেক এলাকায় পাঠানো হলো। আফজাল ও ছোবানকে হাফানিয়া ক্যাম্প থেকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে আসামের শিলচর লায়লাপুরে প্রশিক্ষণ শেষে আগরতলার মতিনগর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করানো হলো। বাংলাদেশে মেলাগড়ে ২নং সেক্টরে মেজর হায়দারের নেতৃত্বে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা প্রস্তুত। চোখে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন। অন্যদিকে বুকে হাহাকার।

লায়লাপুর হাফানিয়া ক্যাম্প থেকে কানুকে পাঠানো হলো ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। প্রশিক্ষণের সময় তার বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকুষতা দেখে ক্যাপ্টেন এ সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকার কথা মনে পড়তেই কানুর মন বিষণ্ন হয়ে যায়। ২৫ মার্চ ঢাকার যে অবস্থা দেখেছে, মনে পড়লে তার গা রি-রি করে।

কানু অত্যন্ত পত্রিকা পাগল। সংবাদ, গণবাংলা, দি পিপলস্, ইত্তেফাক-এর অফিসগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কবি শহিদ সাহেব সংবাদ অফিসেই রাতে থাকতেন। এখানেই ছিল তার ঘরবাড়ি। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেলেন তিনি সংবাদ অফিসেই। কানু কতদিন পত্রিকা পড়ে না। পত্রিকায় পড়ার মতো কিছুই নেই এখন। একটা পত্রিকা পেয়ে যায় ভাগ্যক্রমে। পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে ভাবে অন্য গেরিলাদের মতো নিজেকে কীভাবে আলাদা করে ছদ্মবেশ ধারণ করা যায়। দৈনিক পাকিস্তানে বলা হয়েছে–

দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিগণ সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা জেনারেল ইয়াহিয়াকে স্বাগত জানিয়েছে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। যারা অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী নয় তাদের ব্যাপারে জনগণকে সজাগ থাকতে বলেছে।

সচিত্র প্রতিবেদন–খোলা বাজারে চালের দাম স্থিতিশীল। চালের ব্যাপারীর ৩২ পাটি দাঁতের হাসিসহ ছবি।

সুইজারল্যান্ডে বাস খাদে পড়ে চারজন নিহত।

এসব পড়ে কানু বিরক্ত, তবুও পড়ছে। সবচেয়ে বিরক্তের খবর পড়েছে জামায়াতের আমির গোলাম আজম জুমার নামাজ পড়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সেনাবাহিনীর দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেছে। নামাজ শেষে শান্তি কমিটির মিছিলেও নেতৃত্ব দিয়েছে। তখনই কানুর মাথা খুলে যায়।

সে আশ্রয়ের কথা চিন্তা করেছে। ঢাকায় তার কোনো আত্মীয় নেই যে তার বাসায় থাকবে কিংবা থাকলেও নিরাপদ নয়। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মসজিদে থাকবে। এই মুহূর্তে মসজিদে থাকাটাই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। তাছাড়া ঢাকার গেরিলাদের কোনো ক্যাম্প নেই। নির্দিষ্ট সময় সবাই যার যার মতো গিয়ে উপস্থিত হবে কারো গ্যারেজ কিংবা মেসে অথবা কোনো আড়তে অথবা পরিত্যক্ত বাড়িতে। মসজিদে থাকতে হলে দাড়ি ও টুপি পরা মুসল্লি হতে হবে। অনেক দিন দাড়ি কামায় না কানু। তাই দাড়ির সমস্যা নেই। আপাদত একটা টুপি ও পাঞ্জাবি হলেই চলবে। কানুর টার্গেট সে সোবাহানবাগ মসজিদে আশ্রয় নিবে।

সোবাহানবাগ মসজিদের খতিব মাওলানা আবুল কাশেম অত্যধিক ভালো মানুষ। কানুকে সর্বাত্মক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও কানু তার নাম, ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে। মাওলানা তার একটি পোষাক ও টুপি দেয় তাকে এবং তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করে অনেক যত্ন সহকারে। কানু আস্তে আস্তে অন্য সবার সাথে কয়েকটি ছোটখাট অপারেশনে সফলতার সাথে অংশ নেয়।

নভেম্বরের মাঝামাঝি কানুর নেতৃত্বে একটি বড় অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয় গেরিলারা। কানু সারা রাত অপারেশনের ছক আঁকে এবং উত্তেজনায় কাঁপে। ঢাকায় কয়েকটি বিদ্যুৎ সাপ্লাই স্টেশনে হামলা করবে তারা। ফুলবাড়িয়া পাওয়ার স্টেশন, তেজগাঁও, মগবাজার, নারিন্দা, পিলখানা এবং শাহবাগে। এর মধ্যে গুলবাগের ১১ কেভি পাওয়ার স্টেশনের হামলার দায়িত্ব নিল কানু ও তার সহযোগীরা। উত্তেজনায় মসজিদের জুব্বা পরেই অপারেশনের জন্য গেল কানু। এতে তার একটা লাভ হলো যাবার পথে দুবার আর্মি টহল গাড়ির সামনে পড়লেও তাকে আটকায়নি। অস্তিনের নিচে গ্রেনেড ও অস্ত্র নিতেও সুবিধা হয়। গত অপারেশনে যাবার পূর্বে তাদের একজন সবজির ব্যাগে অস্ত্রসহ ধরা পড়ে। পরে তাকে আর্মিরা দাঁড় করিয়ে গায়ের চামড়া চুরি দিয়ে ছিলে পায়ুপথে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে।

হঠাৎ ড্রিম ড্রিম আর ঠ্যা ঠ্যা ঠ্যা। ব্যস, ভস্মীভূত হলো পাওয়ার স্টেশন। ঢাকার অর্ধেক বিদ্যুতের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই।

অপারেশন শেষে এশার নামাজের পূর্ব মুহূর্তে কানু মসজিদে পৌঁছেই সুখবরটা মাওলানাকে দেয়। মাওলানা আলহামদুলিল্লাহ বলে চিৎকার করে কানুকে চুমু খায়। এ উত্তেজনায় আশেপাশে কেউ আছে কি না তার খেয়াল ছিল না। রাজাকার তনাই মোল্লা নিয়মিত এই মসজিদে নামাজ পড়ে। এটি তার কানে যায়। বুঝতে বাকি থাকে না তনাই মোল্লার। সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে আর্মি ক্যাম্পের দিকে।

পরদিন কোন অপারেশনে যাবে তার রফা করতে পোষাক বদলে বেরিয়ে পড়ে কানু। যাবার পূর্বে বলে, চাচাজি রাতের খাবার আমি খাওয়াবো। পুরান ঢাকার কাচ্চি। খুব স্বাদের খাবার।

ঠিক আছে বাবা, জবাব দেয় মাওলানা।

এশার নামাজ শেষ করে মুসুল্লীগণ বাড়ি চলে গেলেন। মাওলানা মোনাজাত ধরে, বেশ লম্বা মোনাজাত। শেষ হবার পূর্বেই তনাই মোল্লাসহ কয়েকজন আর্মি। পুরো মসজিদ তছনছ করে গেরিলা না পেয়ে মাওলানাকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে।

কানু পুরান ঢাকার গবু হাজির বিরানী নিয়ে হাজির হয় সোবাহানবাগ মসজিদে। মসজিদ তছনছ ও মাওলানার দেখা না পেয়ে বের হয়ে যায়। পরে পাশে একটি চা স্টলে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে আর্মি ধরে নিয়েছে হুজুরকে।

পরদিন কানু মাওলানার লাশের খোঁজ পায় ধানমন্ডি খালের পাড়। চুল-দাড়ি ক্যাচি দিয়ে কামানো ও উলঙ্গ। মাওলানার একটি কথা মনে পড়েছে কানুর, 'বাবা, ওরা মানুষ হত্যা করছে, তোমরা পশু হত্যা করো। ওরা মানুষ না। ধর্মের দোহাই দিয়ে ওরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছে।'

৪

দলনেতা ইমরান। আরো আসে ঝন্টু, আমিন, ফরহাদ, সুমন ও ইদ্রিস, ট্রেইনড হওয়া কিছু ছেলে। দলনেতা ইমরান নতুন ছেলেদের ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। গুজব আছে যুদ্ধের আগে এরা ইসলামী ছাত্রসংঘের সাথে যুক্ত ছিল। তারচেয়ে ভয়ের কথা আমিনের বাবা মাওলানা হাবিব উল্লাহ ফরিদপুরের

চিহ্নিত রাজাকার। তার পাড়াতো ভাই আলী আহসান ইসলামী ছাত্রসংঘের পূর্ব পাকিস্তানের সভাপতি।

খড়ের গাদার বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে ঝন্টু। আরামদায়ক বিছানা বলতে তার কাছে মনে হচ্ছে এটাই, তেল চিটচিটে কাথা আর নিচে খড়ের গদ্দা। পাশাপাশি কয়েকটা বিছানা। ঝন্টু আহামরি লম্বা মানুষ নয়। তারপরও তার পা বিছানার বাইরে। ক্লান্তির শরীর এলিয়ে দিয়েছে কিন্তু আরামের ঘুম হচ্ছে না বালিশের অভাবে। খালি গায়ে খড়ের আঁচড়ে তীব্র চুলকানি আর মশার উৎপাত। তার পাশে শুয়ে থাকা জনা সাতেক মানুষের ক্লান্ত ঘুমের বিচিত্র নাক ঢাকার শব্দে হারাম হয়েছে আরামের পরিবেশ। চোখ বুঝে মৃত মানুষের মতো নিদ্রাদেবীকে স্মরণ করে শুয়ে থাকে ঝন্টু।

আগস্টের মাঝামাঝি। বর্ষার একটানা কাদুনী শেষে শরৎ আসি আসি করছে। মেঘেরা তাদের পোষাক বদলে নিয়ে শ্বেতশুভ্র হয়েছে। রাগান্বিত চোখ আর আকাশে চোখধাঁধানো নীল। রাস্তার পাশের জমিগুলোতে হাঁটু পানি। ভালো করে খেয়াল করলে ছোট ছোট মাছের উপস্থিতি চোখে পড়ে। যুদ্ধ না হলে হয়তো ঝন্টু নেমে পড়ত মাছ ধরতে। তার মাছ ধরার প্রচণ্ড নেশা। যদিও পেশায় তারা মাঝি দাশ। মাছ ধরা জেলে জাত নয়। মানুষের আবার জাত কীসের, ভাবে ঝন্টু। তার গ্রামে বহু হিন্দুর বসবাস। পাশাপাশি থাকে সবাই কিন্তু সবসময় চলে জাত-পাতে বিচার। হিন্দুদের মধ্যে প্রধান চারটি জাত–ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। তারা মাঝিরা পড়ছে সর্বনিম্ন জাতে। ঝন্টু মাঝে মাঝে ভাবে এগুলো মানুষের সৃষ্টি। ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। কারণ জাত ভগবানের সৃষ্টি নয়। মানুষের কর্ম অনুসারে আদিকালের কিছু মানুষ তাদের হীন স্বার্থেই জাত সৃষ্টি করেছে। যারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ-সাদি ও সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে তাদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হলো যুদ্ধ পরিচালনা, ক্ষণ ও রাশি গণনাকারীরা, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালকরা বৈশ্য। অন্যান্যদের পেশা যেমন তাঁতী, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, কৃষক তারা শুদ্র। আর যারা মুচি, সুইপারসহ কিছু পেশায় মানুষ রয়ে গেল জাতের বাইরে। তারা সমাজের অস্পৃশ্য। মহত্মা গান্ধী ওদের নাম দিয়ে হরিজন/ভগবানের জাত।

যাক সে কথা। খালি হাতে ছুটন্ত মাছ পাকড়াও করা খুব যে গোলমেলে ব্যাপার না, সেটা ঝন্টুকে দেখলে বিশ্বাস হয়। মাছের ঝাঁক থেকে ঝন্টুর চোখ যায় দূরের রাস্তার দিকে। হুডওয়ালা একটি আর্মির জিপ দেখে ঝন্টু নিজেকে লুকিয়ে ফেলে শনঝোপের আড়ালে। হাতে তার থ্রিনটথ্রি রাইফেল। চট করে চোখ বুলিয়ে নেয় চারপাশ। তার সঙ্গীরা পজিশন নিয়েছে। সাত আটজনের ছোট টহল দল। এর মধ্যে আফজাল রাস্তা থেকে নেমে পড়েছে ধানক্ষেতের গভীরে। এদিকটার পানি একটু বেশি। রোদের তীব্রতায় পানি একটু কুসুম গরম। আফজালের হাতে দলের একমাত্র এলএমজি। ঝন্টু নির্দেশের অপেক্ষায় তাকায় দলনেতা ইমরানের দিকে। তার কালো ফ্রেমের চশমায় দুশ্চিন্তার ছাপ। ঝন্টুসহ অন্যদের পানিতে নামার আদেশ দেয় ইমরান। গ্রামের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পুকুর সাতারু ঢোড়া সাপের মতোই এগিয়ে যায় মুক্তিবাহিনী। খানিকটা দূরে গিয়ে নিজেদের আড়াল করে। জমির আইল ধরে রাইফেল রেখে কানি বকের মতো অপেক্ষা করে জানোয়ারদের জন্য। চোখেমুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। দলের নতুন সদস্য, সদ্য রিক্রুট হওয়া জনা চারেকের সহ্যসীমা অতিক্রম করে। ঘন ঘন হাই তুলে তাদের উত্তেজনা কমাতে চায়। ইমরান তাদের দিকে তাকায় খানিকটা দুশ্চিন্তা নিয়ে।

আফজাল খানিকটা মাথা উঁচু করে পাকবাহিনীর জিপটাকে অনুমান করতে চায়। খুক করে কেশে উঠে ফরহাদ। চট করে মুখ চেপে ধরে ঝন্টু। আচম্‌কা করতে গিয়ে তার হাত ও ফরহাদের মুখের সংঘর্ষটা থাপ্পরের মতো শোনায়। ফরহাদ থাপ্পর খেয়ে আচমকা ভড়কে যায়। অমনি আমিন উত্তেজনায় টিপে দেয় ট্রিগার। ঘটনার স্থায়িত্ব কম। পাঞ্জাবি মিলিটারি ড্রাইভার আচমকা গতি কমিয়ে গাড়ির মুখ উল্টোদিকে ঘোরায়। জিপে বসা সৈনিকরা বুলেটের জবাব দিতে দিতে তাদের ডেরায় ফিরে। রাস্তায় ধুলির ওড়াউড়িতে দূরের গ্রামগুলোকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল মনে হয়। পাকিস্তানি পশুগুলো ফিরে গেছে নিজেদের আস্তানায়। এবার দল ভারী করেই ফিরবে তারা। দলনেতা সবাইকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়। তাড়াতাড়ি ফেরাই মঙ্গল।

তাদের আস্তানায় ফিরেই গণ্ডগোল। আমিনকে কষে থাপ্পড় মারে আফজাল। বয়স ও ফিল্ডে সে সিনিয়র। দলে নির্দেশ ছিল দলের নেতার

নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার। এরা যুদ্ধের ব্যাকরণ মানে না। থাপ্পড় খেয়ে বাঁকা হয়ে যায় আমিন। গলার স্বর সপ্তমে তুলে বলে, এইটা ঝন্টুদার দোষ। সালা মালাউন তুই ফরহাদের গায়ে হাত দিলি কেন?

ঝন্টুর শরীরে কেউ যেন এসিড ছুড়ে দিল মনে হচ্ছে। রাগে তার মাথাটা ভনভন করে উঠেছে। মালাউন শব্দটা সে প্রায়ই শুনে। যেন এ দেশে সে জন্মেছে মালাউন শব্দটা শোনার জন্যই। আমিনের গালির তীব্রতা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে আমিন কষে থাপ্পড় মারে ঝন্টুর গালে। সে মালাউন ঝন্টু। সে সংখ্যালঘু। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি না হয় ঘোষিত সাম্প্রদায়িক। কিন্তু এ যুদ্ধ তো অসম্প্রদায়িক, সমতা ও সাম্যের যুদ্ধ। মাথা উঁচু করে জাতীয় পতাকা তুলে আত্মপরিচয় দেবার যুদ্ধ। কষ্টে আদ্র গলায় আক্ষেপ গিলে খেতে পারছে না ঝন্টু। দলনেতা ইমরানের প্রতিক্রিয়া ছিল দেখার মতো। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে সে। আমিনকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে ক্রমাগত লাথিতে ঘৃণা উগরে দেয়। আমিনকে এক পর্যায়ে বেঁধে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

শুধু দাঁড়িয়ে থাকে আমিনের তিন বন্ধু ফরহাদ, সুমন ও ইদ্রিস। সামরিক দলের জন্য শৃংখলা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। আমিন সেটা ভেঙ্গেছে। দলনেতা হিসেবে ইমরানের দায়িত্ব উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। যুদ্ধের ময়দানে লঘু শাস্তির কোনো বিধান নেই। এখানে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় সাধারণত মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে।

ঘরের পেছনের বুড়ো কাঁঠালগাছে পিছমোড়া করে আমিনকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথা নীচু করে একটানা ফুপিয়ে চলেছে সে। নিজের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় থাকা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম প্রতীক্ষা। বারবার মনে হচ্ছে ক্ষুদিরামের কথা। পত্রিকায় ঝাপসা সাদা-কালো ছবি দেখেছে সে ক্ষুদিরামের। কোথায় কী? ক্ষুদিরাম হয়েছিল শহীদ। আর দেশ স্বাধীন হলে কেউ তাকে শহীদের মর্যাদা দেবে না। তার জীবনকে এখন অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। সহযোদ্ধারা মুখ খিচিয়ে বর্ণনা করবে তার বেয়াড়াপনার কথা। দুই হাতের বাঁধন ছিড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে তার। ছোট কীটকেও তার চেয়ে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমিনের। নিজের পরিণতির কথা ভেবে কান্নায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সে। পাগলের মতো যা তা ভেবে যায় সে।

ঝন্টু আকাশমুখী হয়ে বিড়ি টানে। সন্ধ্যায় এক সানকি পান্তা গিলেছে। সাধারণত আহারের পর দলের বাসিন্দাদের হাত ঘুরে দুই তিন টান বিড়ি পাওয়া যায়। এ জন্য ধীরে ধীরে তামাকের প্রতি তার আসক্তি জন্মাচ্ছে। ঝন্টু ভাবে, তামাক না টানলে কিংবা দু-একটা নেশা না করলে সে আবার পুরুষ নাকি। ঝন্টুর মাথাজুড়ে এখন শুধু আমিন। বিড়িতে শুকটান দিয়ে জানালা দিয়ে বাহিরে তাকায়।

মানুষের মধ্যে দ্বৈত সত্ত্বা আছে। নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের অন্য সত্ত্বার সাথে কথা বলে সময় পার করে। যেটা মাঝে মাঝে ঝন্টুও করে। ঝন্টু আমিনকে খুব ভালো করে খেয়াল করে। লোমশ পা ছড়িয়ে বসে আছে। ফুল হাতা শার্টটি এখানে-ওখানে ছিড়ে গেছে। মুখে বিকালের আঘাতের চিহ্ন। আমিনকে ঝন্টুর ছোট ভাই মন্টু মনে করে ভ্রম হয়। পান খাওয়া মন্টু সদাই সুর করে ডেকে উঠত দাদা। আফজালের বিড়ির প্যাকেট থেকে এক শলা বিড়ি সরিয়ে ঘরের বাহিরে বের হয় ঝন্টু। আমিনের সামনে এসে বসে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঠোকে। চোখের সামনে ঝন্টুকে দেখে আমিনের দৃষ্টিতে ভর করে তীব্র ভয়। যেন আজরাইল এসেছে তার সামনে।

আমারে মারতে আইছ ঝন্টুদা?

ঝন্টু হাসে। জল্লাদের নির্বাক হাসি আর বিড়িতে ফুঁক।

আমিনের গা কাটা দেয়। কলেমা শাহাদাৎ আওরাতে গিয়ে ভুলে যায়। ক্ষুদিরামের ছবিটা চোখে ভাসে। ঝন্টু আমিনের পেছনে গিয়ে কোমর থেকে ছুরিটা বের করে। আমিনের হাতের বাঁধন খুলে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিন বিস্মিত হতেও ভুলে যায়।

পরদিন রণাঙ্গনে তীব্র লড়াইয়ে তাদের দল থেকে ঝন্টু ও ইদ্রিস শহীদ হয়। গুরুতর আহত হয় আফজাল। ত্রিপুরার একটি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ে আফজাল। তার বুক পকেটে একটি চিঠি মাকে লেখা, অন্যটি প্রেয়সী রীনাকে।

আম্মা,

আমার ছালাম নিবেন। আব্বাকেও আমার হাজার হাজার ছালাম দিবেন। আর আমাকে মাফ করে দিতে বলবেন। কারণ আপনাদের অনুমতি না নিয়ে

বাড়ির বাইরে আসছি যুদ্ধ করতে। আম্মা, এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ওরা জানোয়ার, হয়তো এখন আপনারা টের পাইতাছেন। আম্মা, বহু অন্যায় করছি আপনার কাছে, তার জন্য ক্ষমা চাই। দোয়া করবেন যেন এ শত্রুদের দেশ-ছাড়া করতে পারি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে ঠাডাও পড়ছে। আম্মা, আপনার কি মনে আছে, আমি ঠাডা ডরাইতাম ছোটবেলা। আপনারে জড়াইয়া ধরে থাকতাম। তারপর থেইক্কা দেখছি আপনে আমি বড় হওয়ার পরও ঠাডা পড়লে আমার পাশে থাকতেন। আম্মা, আপনার কথা খুব মনে পরতাছে। এহন ঠাডা ভয় পাই না। অনেক বড় বোমার আওয়াজও ভয় পাই না। সামনে অনেক মরা মানুষ দেখেও ভয় পাই না। শুধু রক্ত টগবগ করে। নিজের দিকে খেয়াল রাইখেন।

আব্বারেও খেয়াল রাইখেন। আম্মা, আপনে হয়তো রীনার কথা জানেন। অরে দেইখেন। নামাজ পইরা দেশটার লাইগা দোয়া কইরেন। আজ রাখি।

ইতি

আপনাদের অবাধ্য ছেলে

আফজাল

রীনার কাছে চিঠি–

রীনা,

কেমন আছো তুমি? বাড়ি থেকে আসার সময় তোমার সাথে দেখা করে আসতে পারি নাই। আসার পথে তোমার জন্য অনেক ছটফট করেছি। বাড়ি গেলে ছোবানরে জিজ্ঞাস কইরো। তোমার জন্য ভয় হয়, বুকটা হুহু করে। আমি ভালো চিঠি লেখতে পারি না। তাই ক্যাম্পের এক বড় ভাইরে দিয়া তোমার ও আম্মার কাছে চিঠি লিখছি। জানি না কবে তোমার কাছে ফিরতে পারবো কিংবা ফিরতে পারবো কিনা। তবে দেশ থেকে এ জানোয়ারদের বিদায় না করে ফিরমু না। সাবধানে থাকবা। ওদের নজর এখন যুবতী মেয়েদের দিকে। পারলে আমাদের বাড়ির দিকে একটু খেয়াল রাইখো। নিজের খেয়াল রেখো। তোমার আব্বা ও আম্মারে আমার ছালাম দিয়ো। সাবধানে থেকো।

ইতি

তোমার হতভাগ্য আফজাল

৫

পুরো নাম মো. মুজিবুর রহমান। ডাক নাম মোহন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টর। স্কুলের ক্লাস শেষে বাসায় গিয়ে স্ত্রী শেফালী বেগমের কাছে বলল, বাড়ি থেকে আব্বাজানের চিঠি এসেছে। দেশের গণ্ডগোলে তারা চিন্তায় আছে। যত দ্রুত সম্ভব গ্রামের বাড়ি যেতে বলছে। এদিকে আমার সরকারী চাকুরী, কীভাবে যাব?

শেফালী বেগম বলল, চলেন বাড়ি চলে যাই, জীবন বাঁচলে চাকুরী হবে।

আমিও তাই ভাবি, কিন্তু তোমার যে অবস্থা কীভাবে যে এত রাস্তা পাড়ি দিবো? ঢাকায় মিলিটারি ক্র্যাকডাউন করছে, এদিকেও আসবে। শুনছি বোম্বিং নাকি হবে। কোনদিন জানি জেলা শহর গুলিতে আর্মিরা ঢুকে পড়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, কাল অফিস করে পরশু রওনা দিবো। এবার একটু হুক্কাটা ধরাও তো।

খালি হুক্কা, এই হুক্কাই আপনার না জানি কোনদিন কোন বিপদ আনে আল্লায় জানে। খিস্তি করে শেফালী।

যা হবার হবে খাইয়া নেই, কখন আর্মির গুলিতে ফুট্টুস, বলে মাস্টার।

অলুক্ষণে কথা কইবেন না। সকালে উঠেই বাড়ি চলে যাব। কোনো কথা বলবেন না।

ঠিক পরদিনই সকালে মোহন মাস্টার স্কুলের কাজ শেষে ফেরত আসার পথে আর্মিদের চেকপোষ্টে পড়ে।

এক জওয়ান জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম বাতাও।

মুজিবুর রহমান। সাথে সাথে চার জওয়ান বন্দুক তাক করে বলল, মুজিব? চলো হামার সাথে, ক্যাম্পে চলো।

মাস্টার কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই টেনে-হিঁচড়ে ক্যাম্পে নিয়ে চলল আর্মিরা।

মাস্টারের মনে হলো এই আমার জীবনের কাহিনী শেষ। হেঁটে যাচ্ছে আর কান্না পাচ্ছে, চোখে ভাসছে স্ত্রী আর মেয়ে নাছরিনের মুখখানা। আর মনে পড়ছে মায়ের কথা, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করিস বাবা। সে আয়তুল কুরসী

পড়ছে আর ভাবছে স্ত্রীর কথা শুনে আজ সকালেই চলে যাওয়া উচিৎ ছিল। খুব কান্না পাচ্ছে তার। সে ছাড়া তার স্ত্রী, কন্যাকে কে বাড়ি পৌছে দেবে। তার অনাগত সন্তানের কথাও মনে পড়ছে। ক্যাম্পে বসে আছে ক্যাম্প ইনচার্জের অপেক্ষায়। এক জওয়ান তাকে কলেমা জিজ্ঞাসা করেছে সে বলে। কিন্তু ভয়ে ভুল হয়েছে। সে জন্য একটা লাথিও খেয়েছে। মাস্টার মনে মনে বলছে বন্দুকের নল ধরে কলেমা কেন নিজের নাম জিজ্ঞাসা করলেও ভুলে যাবে যে কেউ। স্বামীর আসতে দেরি দেখে শেফালী বেগম ও তার মা কান্না শুরু করে।

সকাল গড়িয়ে বিকেল।

ক্যাপ্টেন আসগর আলীখান বলল, তোমহারা নাম বাতাও, ডান্ডি কার্ড দেখাও। মোহন মাস্টার ডান্ডি কার্ড দেখায়। ক্যাপ্টেন দেখে তাকে ছেড়ে দিতে বলে। মাস্টার হাফ ছেড়ে বাঁচে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

ধীরলয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করে যত দ্রুত সম্ভব এলাকা ছাড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, এবার আর কোনো দিকে নয়, সোজা গ্রামের বাড়ি।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। ঘাগুটিয়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তিতাস নদী দিয়ে পাক আর্মির লঞ্চ যাচ্ছে। হোমনার গেরিলাদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ শেষে পার্শ্ববর্তী থানা বাঞ্ছারামপুরে আক্রমনের জন্য। পথে ঘাগুটিয়ার কাছে তুমুল প্রতিরোধের শিকার হয় পাকবাহিনী। লঞ্চের অর্ধাংশ ধ্বসিয়ে দেয় মুক্তিযোদ্ধারা। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালায় পাকবাহিনী।

আক্রমনের পরদিন বাঞ্ছারামপুরগামী একটি যাত্রীবাহী ফেরীলঞ্চকে হোমনা থানায় আটক করা হয়। লঞ্চে বিভিন্ন বয়সের ৩০/৪০জন যাত্রী ছিল। পুরুষ ও ছেলেদের একটি ঘরে আটক রেখে চালায় স্টীম রোলার। মহিলাদের উপর চলে পাশবিক নির্যাতন। সবাইকে জড়ো করে মধ্যরাতে গণেশ নাথের পুকুরে ব্রাশ ফায়ার করে মাটি চাপা দেয়া হয়। অক্টোবর মাসে পাক আর্মি যখন ঘাগুটিয়া গ্রামে প্রথম ভূমিতে নেমে হানা দেয় তখন আর সকলের মতোই যে

যেভাবে পেরেছে আশপাশের গ্রামে যার যার আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিতে যায়। কারো আশ্রয় মিলে, কারো না।

রাজ্জাক মেম্বারও তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নিতে পূর্বেকার দিনগুলির মতো পার্শ্ববর্তী গ্রাম রামপুরে, তার শ্বশুরবাড়িতে। সেখানেও চলে বিপত্তি। তার ফুফু শাশুড়ী বলে, আইছে সব খেতার গাট্টি লইয়া। কোথায় একটু ফুট্টুর আওয়াজ শুনে না শুনে দলবল লইয়া হাজির।

এই কথা শুনে মেম্বার চলে যেতে চায়। কিন্তু রাবেয়া বেগম বলে, পোয়াতী মেয়ে ও কচি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কোথায় যামু? রাইতটা কাটাইয়া ভোরে অন্যদিকে চিন্তা করুম। অগত্যা মেম্বার থেকে যায় তার শ্বশুর বাড়ি। আর চিন্তা করে, তার শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে থাকলে এমনটা হতো না। রাবেয়া বেগম চিন্তা করে কতো আদরের জামাই ছিলেন তিনি অথচ আজ এই বিপদের দিনে মানুষের ভর্ৎসনা শুনে থাকতে হচ্ছে। মনে পড়ে একবার অনেকদিন পর রাজ্জাক মেম্বার তার শ্বশুর বাড়িতে যায়। শাশুড়ীর আদর দেখে তার কান্না পাচ্ছিল, চোখের পানি ভাতের বাসনে টুপ করে পড়ছিল। তখন রাবেয়া বেগমের মনে হচ্ছিল–এত সুন্দর ও শক্ত মানুষটাকে এই প্রথম কাঁদতে দেখলাম।

নভেম্বরের শেষ দিক। পাকবাহিনী আবার ঘাগুটিয়া আসে। পাকবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সাতবিলা গ্রামের বাতেন সবসময় হোমনা থানা কম্পাউন্ডে থাকে। এদিকে মিত্র বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। হোমনার মুক্তি বাহিনী বেইস ক্যাম্প মঙ্গলকান্দীতে। বিএলএফ-এর বেইস শোভারামপুরে।

সাতবিলা গ্রামের সর্বদক্ষিণের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে এক খোড়া নদী। নদীর তীরে বটগাছটি প্রাচীন ও কিংবদন্তীসম। গাছটি ঘিরে অনাবাদী জমি ও জঙ্গল। সেখানেই বাস করত ওলা দেবীর এক পুত্র। সারা বছর সে ঘুমিয়ে কাটাত। বছরের নির্দিষ্ট একটি সময় ওলা দেবী আসত ছেলের সংগে দেখা করতে। পরনে সাদা বকের মতো ধবধবে শাড়ি। পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা চুল। যুদ্ধ শুরুর কয়েক বছর আগে সে তার পুত্রসহ এ বটগাছে আস্তানা করে। ওলা দেবী গ্রামে আসা মানে গ্রামে কলেরা ও বসন্ত দেখা দেওয়া। এ বছর এক সন্ধ্যায় ওলা দেবী বটগাছে এসে যখন প্রথম বসেছিল তখন ঝাঁকিজাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল পাগলাটে জয়েনউদ্দিন। সেই প্রথম দেখতে পেয়েছিল দৃশ্যটি। মড়কের দেবীকে চেনামাত্র সে বাড়িতে ছুটে এসে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করে টিনের চালা বাজিয়ে। তারপর দেবী যাতে কোনো বাড়িতে নামতে না পারে সেজন্য গোটা গ্রামে এক অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেক বাড়িতে থালা বাটি লোটা বদনা ইত্যাদি বাজাতে শুরু করে, সেই সঙ্গে অনেকের কণ্ঠে আজান। এ বাড়ির শব্দ শুনে ও বাড়ি, ও বাড়ি থেকে পরের বাড়ি, এই ভাবে গোটা গ্রামে এক অভূতপূর্ব শব্দ তৈরি হয়। আতঙ্ক সৃষ্টি থেকে বিরামহীন শব্দের ঐকতান সেই শঙ্কাকে আরো আতঙ্কময় করে তুললে গোয়ালের গরু, খোয়ারের মুরগি, কোলের শিশু, এমনকি রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলোও নীরব থাকেনি। সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে সে যাত্রায় ওলা দেবী তার ছেলেকে নিয়ে বটগাছ থেকে ওড়াল দিয়ে, খোড়া নদীর তীর ধরে সোজা দক্ষিণে অন্য আস্তানার খোঁজে চলে যেতে দেখেছে অনেকেই। এর পুরো কৃতিত্ব জয়েনউদ্দিনের।

ওলাদেবীর ভয়ের মতোই পাকবাহিনীর ভয় গ্রাস করেছে গ্রামটিকে। কলেরা দেবীকে তাড়াবার ঘটনা উল্লেখ করে গ্রামবাসীকে সাহস দেয় জয়েনউদ্দিন।

ঘাগুটিয়া গ্রামে পাকবাহিনীর পরপর আক্রমণের কথা শুনে বোন ও ভাগ্নীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে জয়েনউদ্দিন। বেজায় সাহস দেখায় সে। প্রতিদিন স্বাধীন বাংলা বেতারের চরমপত্র ও সংবাদ শোনার জন্য এক বাড়িতে

সবাই জড়ো হয়। সর্বগ্রাসী মিলিটারি আতঙ্কের মাঝে স্বাধীন বাংলা বেতারের মগ্ন থাকা কিছু সময় গ্রামবাসীর সান্ত্বনা ও প্রতিরোধযুদ্ধ। জয়েনউদ্দিন মুজিব ভক্ত। রেডিও থেমে যাবার পর ভিড়ে নানান গল্প হয়। সরলচাষী জয়েনউদ্দিনকে ঠাট্টা মশকরা করে মুজিবের ধর্মবেটা বলে খেপাতে চেষ্টা করে। রেকর্ডে প্রথম শেখ মুজিবের ৭ মর্চের ভাষণ শুনে, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ভেতরে জীবন্ত শেখ মুজিবুরকে আবিষ্কারের আনন্দে লাফাত জয়েনউদ্দিন– কে বলে শেখ মুজিব নাই? কোন শালায় কয় শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের জেলে মেরে ফেলেছে? এই দেখ, নিজ কানে শোন। তারপর স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে শেখ মুজিব থাকা না থাকা নিয়ে তর্কে মাতে গ্রামের সহজ সরল চাষা মানুষগুলো।

একরাতে সদ্য স্বাধীনবাংলা বেতারের খবরের পর্যালোচনা চলছিল। একজন হঠাৎ খবর দেয় গ্রামে মিলিটারি আসছে। তাদের সংগে বাতেন। মিলিটারি আসছে শুনেই গ্রামের মানুষগুলো পালাতে শুরু করে। কিন্তু উত্তেজিত কণ্ঠে জয়েনউদ্দিন লাঠি বল্লম হাতে প্রতিরোধের আহ্বান জানায়। জয়েনউদ্দিনের আহবানে সাড়া দেয় না কেউ। তারা জানে যে পাকবাহিনী ওলা দেবীর মতো নীরিহ মেয়েমানুষ নয় যে ছেলেসমেত পালাবে। সংখ্যায় তারা অনেক এবং সিংহের চেয়েও হিংস্র। কলেরা দেবী মানুষ মারতে দু একদিন দেরি করে কিন্তু মিলিটারি চোখের পলকে মানুষের কলজে ফুটো করে দেয়। মেয়ে মানুষ দেখলে তাদের বেআব্রু করে বিশেষ অঙ্গ কেটে নিয়ে তা চিবিয়ে খায়। আর যেটাকে পছন্দের তালিকায় রাখে তাকে জিইয়ে রাখে বারবার রক্ত চোষার জন্য। পুরুষ মানুষের লুঙ্গি তোলো তার মুসলমানিত্ব দেখে এবং জবানে উর্দু-আরবি ভাষা না ফুটলে তার দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নিতে এক মিনিটও সময় নেয় না।

সবাই পালিয়ে যায় বটগাছের পাশে জংলায়। যেখানে দিনের বেলায় গরুছাগল ভয়ে পেশাব পর্যন্ত করতে আসে না। পাকবাহিনীর ভয়ের কাছে ওলাদেবীর ভয় তুচ্ছ হয়।

সে রাতে সাতবিলায় মিলিটারি আসেনি তবে এসেছিল পাশ্ববর্তী গ্রামে। মিলিটারির ভয়ের লজ্জা ভুলতে গ্রামের কতিপয় যুবক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে

প্রস্তুত হয়। জয়েনউদ্দিনের ১৫ বছরের ছেলে কাসেম বাবার সাথে হাল চাষ ও খেলাধুলা করে সময় কাটায়। যুবকরা কেউ কারো বাড়িতে যুদ্ধে যাবার কথা বলে না। কারণ কোনো বাবা-মা চাইবে না তার সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে। কিন্তু একজন বাবা ব্যতিক্রম, জয়েনউদ্দিন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কথা শুনে তার ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠাতে চায়। ঘরসংসার, বোন ও তার সুন্দরী ভাগ্নী রীনা না থাকলে সেও যোগ দিত যুবক ছেলেদের সংগে। সে জানে দেশ স্বাধীন না হলে সবাইকে মরতে হবে মিলিটারির গুলি খেয়ে। দুর্গম ও দীর্ঘপথ যাবার সময় খাবার জন্য সবার ও ছেলের হাতে চিরামুড়ির পোটলা দিয়ে কান্না লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে জয়েনউদ্দিন।

৭

দরিদ্র বাবার মেট্রিক ফেল ছেলে বাতেন। গ্রামে কোনো কদর নেই আবার কাজ পাবারও যোগ্যতা নেই। পাকবাহিনীর পক্ষে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে যাওয়া সম্ভব হয়নি, কখন গেরিলা আক্রমণের মুখে পড়ে সেই ভয়ে। তাই তাদের পক্ষ হয়ে পাকিস্তান রক্ষার জন্য জামায়াতে ইসলামির মাধ্যমে বাঙালি যুবকদের প্রলোভন দেখিয়ে দালালবাহিনীতে যোগ দেওয়ানো হয়। বাতেন যেন সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাকে ধরে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হয়ে এলাকার রাজাকার কমান্ডার হয় বাতেন। আরও ১০-১২ জন যুবক নিয়ে সব সময় থানা কম্পাউন্ডে যাতায়াত ও গ্রামের স্কুলে আস্তানা গাড়ে সে।

রাতে মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতার পক্ষ শক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য দলবল নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে টহল দিত বাতেন। প্রকাশ্যে বা লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র শোনা ও জয় বাংলার পক্ষে টু শব্দ করা এবং ভারতে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল সে। স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার জন্য বিভিন্ন গ্রামের ৭টি রেডিও ভেঙ্গেছিল। শুধু তা করে তার রাগ কমেনি। অপরাধীর কাছ থেকে রাজাকার ক্যাম্পের রসদ হেসাবে চাল, ডাল, খাসি, মুরগি ও নগদ অর্থ আদায় করে।

স্বাধীন বাংলা নেশা ধরেছিল জয়েনউদ্দিনের। একদিন না শুনলে সে পাগল পাগল লাগত। একদিন রাতে যুদ্ধের খবরের অদম্য নেশায় স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার সময় বাতেনের কাছে ধরা পড়ে। যেসব বাড়ির ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে গেছে তারের তালিকা পকেটে রাখে বাতেন। জয়েনউদ্দিনের পরিচয় তার কাছে অজানা ছিল না। এবং অজানা ছিল না তার বাড়িতে কে কে আছে। কোন কোন বাড়িতে যুবতি মেয়েছেলে ছিল, তার কাছে সেই তালিকা ছিল।

৩ বেন্ড রেডিওটি ভেঙে খানখান করে ক্রোধে বলে, 'শেখ মুজিবের ধর্মবেটা আজ তোকে দেখাব।

জয়েনউদ্দিনের সহ্য হয়নি। চিৎকার করে জানতে চায়, বাঙালি হয়েও বাঙালির উপর এমন জুলুম করতে তোর বিবেক কি একবারও বাধা দেয় না?

এত বড় সাহস! জয় বাংলার পক্ষ নিয়ে আমার সামনে কথা কছ! রাজাকার কমান্ডার বাতেনের সামনে তোর ধর্মবাপ মুজিব আর মুক্তি ছেলের ভয় দেখাস? জয় বাংলা আজ তোর গোয়া দিয়া ঢোকামু। চল, তোর বাড়ি চল।

রাজাকার দলের এক চামচা জয়েনউদ্দিনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কিছু মনে কইরেন না ভাই। এটা আমাদের চাকরি। একদিকে মুক্তিবাহিনীর ভয় অন্যদিকে মিলিটারির ধাতানি। নগদ টাকা পয়সা সোনাদানা যা আছে দেন কমান্ডার সাহেবকে ঠাণ্ডা রাখি।

জয়েনউদ্দিনের বাড়িতে নগদ টাকা ও সোনাদানা না পেয়ে নিয়ে যায় তার একমাত্র খাসি ও কিছু চাল।

টেনে হিচড়ে রীনাকে নিয়ে যায় তার মা ও মামার সামনে থেকে। বাতেনের পা ধরেও কাজ হয় না আর আপন প্রাণ বাঁচানোর নীতি অবলম্বন করে কেউ জয়েনউদ্দিনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না।

যাবার আগে বাতেন বলে, তোর ভাগ্নিকে নিলাম তোর জয় বাংলার ভ্যাট দিতে আর্মিদের কাছে।

সেই সাত দিন

তখনও সূর্য উঁকি দেয়নি ঘাগুটিয়ার আকাশে। কিন্তু তার লালিমায় চারিদিক আলোকিত। আফজাল নিজেও জানে না তার রীনার কী হয়েছে? দেশ স্বাধীনের সুখে সে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল নৌকার ভেতর। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে ওপারে শকুনের ঝাঁক বসে আছে। বুঝতে আর বাকি থাকে না তার। বাঞ্ছারামপুর থেকে মিলিটারিরা ঢাকার দিকে যাচ্ছে। তার মানে এখন তারা নদী পাড় হতে চায়। কিন্তু নিজেকে আড়াল করে একটি রেউনা গাছের আড়ালে চলে যায় আফজাল। সে বুঝতে পারে নৌকায় থাকলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। এর আগে বহুবার এই পথে এসেছে মিলিটারিরা। কিন্তু ঘাগুটিয়া কোনো না কোনো মতে বেঁচে গিয়েছে। আর মার খেয়েছে মিলিটারিরা। সেই প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহাও তাদের থাকতে পারে। সে গাঁয়ের ভেতর গিয়ে চিৎকার করে জানান দেয় যে মিলিটারি নদীর ওই পাড়ে বসে আছে।

মানুষ যে যার মতো ছুটছে থাকে।

৯৫ জন পাক সেনা ক্যাম্প করে ঘাগুটিয়া জামে মসজিদে। শুরু হয় বর্বর হত্যাকাণ্ড। যাকে যেখানে পায় সেখানে গুলি করছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবতি মেয়েদের ধরে আনা হয়েছে। রাখা হয়েছে প্রাইমারি স্কুলের একটি কক্ষে। রাতে চলে পাশবিক নির্যাতন। ঐ মেয়েদের সাথে আফজালের প্রেমিকা রীনাও আছে।

১৭ ডিসেম্বর ঘাগুটিয়া তিতাসের পশ্চিম পারে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ধরে আনা ১৭ জনকে একসাথে ব্রাশ ফায়ার করে মিলিটারিরা। সৌভাগ্যবশত বেঁচে যায় নালাদক্ষিণ গ্রামের আলী হুসেন।

ঐ দিন থানা কমান্ডার আউয়ালের নেতৃত্বে গ্রামের ঈদগাহ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধারা। পাক বাহিনীর ভারী অস্ত্রের আক্রমনে পিছু হটতে বাধ্য হয়ে মুক্তিবাহিনী চলে যায়। আহত হয় মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মোল্লা ও ইব্রাহিম।

১৮ তারিখ ৩৭০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল ঘাগুটিয়া আসে শত্রুমুক্ত করতে। চারদিকের আক্রমণে পাকবাহিনী কোনঠাসা হয়ে পড়ে। তাদের ছিল

ভারী অস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ। তারা সবাই মসজিদ ও স্কুলের ব্যাংকারে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের জবাব দেয়। কখনও একটানা আবার কখনও থেমে থেমে চলতে থাকে যুদ্ধ।

কয়েক দিন যুদ্ধ করবার মতো প্রয়োজনীয় রসদ রয়েছে মিলিটারিদের কাছে। ১৯ তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা আরো সামনে পজিশন নেয়। ঐ দিনের তুমুল লড়াইয়ে শহীদ হন ঝগড়ার চড়ের মতিউর রহমান ও ভবানিপুরের আ. মান্নান। আহত হয় রামপুরের লিয়াকত আলী ও চন্দনপুরের আব্বাস মিয়া।

২০ তারিখ বিকেলে আরেকটা তুমুল যুদ্ধ হয়। সেদিন আরও দু'জন শহীদ হয়, পাথালিয়া কান্দির অলেক মিয়া ও রামপুরের আবুল কাশেম। গুলি লাগে থানা কমান্ডার দাড়িগাঁওয়ের আ. আউয়ালের।

২৩ তারিখ মিত্র বাহিনী দুটি ট্যাংক আসে ঘাগুটিয়ায়। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয় এলাকার সাহসী জনগণ।

পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পনের জন্য বারবার আহ্বান জানানোর পরও যখন সাড়া পায় না তখন মিত্রবাহিনী সিদ্ধান্ত নেয় মসজিদটি গুড়িয়ে দিতে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকাবাসীর প্রবল আপত্তিতে মসজিদে কামানের গোলা তারা ছুড়েনি। রাত দশটায় পাকসেনারা বের হয়ে আসে আত্মসমর্পনের জন্য। একে একে ৮২ জন। ঘাগুটিয়ার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত জয় বাংলা স্লোগানে।

ভয়ংকর ৭দিন শেষে গ্রামের মানুষ ফিরে আসে যার যার বাড়ি। কেউ কারো বাড়িঘর চিনতে পারে না। পুরো গ্রামের দু'চারটি ঘর ছাড়া বাকি সব পুড়ে ছাই। মেরেছে গ্রামের ১৪ জন নারী-পুরুষকে। প্রতিটি লাশের পাশে নির্মমতার সাক্ষী। টিনওয়ালা বাড়ি ওয়ারিশের দাদী জেওরের নেছার লাশ পাওয়া যায় আধখাওয়া অবস্থায় বাঁশঝাড়ের চিপায়। পাগলা খুরশিদের লাশ পাওয়া যায় মাথার খুলি উড়ানো। সে কাউয়ার টেক থেকে এসেছিল জেফত খেতে। কে বা কারা তাকে বলেছে ঘাগুটিয়া জেফত হচ্ছে। মুরালীর লাশ পাওয়া যায় গরুর খুঁটিতে বসা অবস্থায়। পায়ুপথে গরুর খুঁটি ঢুকিয়ে তাকে মারা হয়েছে। লাশের গন্ধে মানুষ নাক চাপা দেয়। ধবংশযজ্ঞের ভেতর বেড়ে ওঠে একটা সবুজ চারা। সেই শিশু গাছের মাথায় এভাবেই স্বাধীনতার সাত দিন পর সূর্য উঠে ঘাগুটিয়ায়।

পুনশ্চ...

সেই সাত দিনে ঘাগুটিয়ায় শহীদ হন

মুক্তিযোদ্ধা অলেক মিয়া, পাথালিয়া কান্দি। মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, রামপুর। মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, ঝগড়ারচর। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান, ভবানীপুর।

ঘাগুটিয়ার জেওরের নেছা, সুফিয়া বেগম, দেওয়ান ভূইয়া, আসমত আলী, হাওয়া বেগম, চেরাগ আলীর স্ত্রী, কাছম আলী, সৈয়দ আলী প্রধান, কিছমত আলী, সৈয়দ আলী, ছন্দু মিয়া, লাল মিয়া, লাল মিয়া (বাচ্চুর বাপ), মুগারচরের জাবেদ আলী (মুরালী), কাওয়ার টেকের খুরশিদ পাগলা।

সেই যুদ্ধে আহত ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা

মো. ইব্রাহীম, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। মো. আব্দুল আওয়াল, দ্বাড়িগাঁও, হোমনা। নবী নূর, দৌলতপুর, হোমনা। শামসুল হক, বড় কলাগাছিয়া, হোমনা। বাশারত মিয়া, রামপুর, হোমনা। লিয়াকত আলী, রামপুর, হোমনা। আব্বাস মিয়া, চন্দনপুর, মেঘনা।

সহযোগী ও গ্রন্থ :

১) আলী রিয়াজ, কলামিস্ট। ২) সোহরাব হাসান, কলামিস্ট। ৩) মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (মাননীয় মন্ত্রী)। ৪) মুক্তিযোদ্ধা নারায়ন দেবনাথ ও আব্দুস সোবহান। ৫) রক্তাক্ত বাংলা, এম আর আক্তার মুকুল। ৬) তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ৭) জোসনা ও জননীর গল্প, হূমায়ুন আহমেদ। ৮) রহস্য পত্রিকা ও একাওরের চিঠি। ৯) মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর। ১০) বন্ধুবর আব্দুস সালাম ভূইয়া। ১১) প্রজন্ম ৭১, হোমনা। ১২) কামাল, ফরহাদ, মিন্টু, সুমন, ইদ্রিস ও কালাম মেম্বার। ১৩) ইমরান হোসেন, নিউ বয়লার মিউজিয়াম। ১৪) মো. রাজীব, আর.এস.এল এন্টারপ্রাইজ। ১৫) ফরিদা ইয়াসমিন, বি.এস.এম.এম.ইউ।